International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-IV, January 2015, Page No. 16-25
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়ন --- কিছু প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রভিত্তিক আলোচনা

শান্তনু নাগ

সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, রাধানগর, নাঙ্গুলপাড়া, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

India is the founder member of WTO since its inception at the middle of the nineties of the last century. Initially the multilateral trade agreement was considered as the instrumental measure to crop up the benefits of globalization. But eventnally it has become evident that, the financial interest of the developed nations are getting health at the cost of financial sacrifice of their underdeveloped (or developing) counterparts in WTO. Such type of biased attitude on the behalf of the proponents of globalization has both apart the parent body and put toward an advirse impact on the process of the execution of multilalival trade. Specially in the field of agriculture, TRIPS, FDI, India is the permanent voice-raiser against the deceptive foul play against the developing members. In a nutshell the future of international trade is at geopardy under the attack of psudo imperialism. Introspective search for a sustainable solution is very necessary in this regard.

Key Words: WTO, globalization, trade, Subsidy, patent, mistrust.

উপক্রমণিকা : সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর একমেরু বিশ্বে বাজার অর্থনীতি একাধিপত্য কায়েম করে। স্বাধীনতার পর মিশ্র অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা-ভিত্তিক মডেলে অভ্যস্ত ভারতবর্ষ এই বাজার অর্থনীতির প্রভাব প্রথম অনুভব করে বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের প্রথমভাগে এসে। ড. মনমোহন সিং-এর অর্থমন্ত্রী হওয়া, তার অল্প কিছুকাল আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া, টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো, চলতি খাতে ভারতীয় টাকার পূর্ণ বিনিময়-যোগ্যতা ঘোষণা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার **(World Trade Organisation** বা সংক্ষেপে **WTO)** প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ ভারতবর্ষের বহুপার্শ্বিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি ঘটনা সচেতন দেশবাসীর সামনে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এককথায় সে ছিল নতুন অর্থনৈতিক দর্শনের সূচনা। গোটা পৃথিবীকে একটি বিশেষ বাণিজ্যনীতির ছাতার তলায় নিয়ে এসে সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার **(WTO)** আত্মপ্রকাশ ঠিক এই উদ্দেশ্যে। প্রাথমিক ভাবে ছিল **GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)**। **GATT**-এর উরুগুয়ে রাউণ্ডে সদস্য দেশগুলির মাধ্যমে **WTO**-র আত্মপ্রকাশ। ১৪৬টি সদস্য দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসের হিসেব অনুযায়ী **WTO** বিশ্ব-বাণিজ্যের ৯৭ শতাংশ অধিকার করেছিল। এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় অর্থনীতির বিশেষ কিছু ক্ষেত্রেবিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বহুপার্শ্বিক চুক্তির ইতিহাস পর্যালোচনা, ফলাফল বিশ্লেষণ এবং ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও সংস্কারের ওপর ঐ চুক্তির প্রভাব আলোচনা। আলোচ্য ক্ষেত্রগুলি হলো যথাক্রমে কৃষি, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব এবং উচ্চশিক্ষা।

ভারতের কৃষিক্ষেত্র ও বহুপার্শ্বিক বাণিজ্যচুক্তি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রারম্ভিক জমানা এবং ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার-এর শৈশব প্রায় সমসাময়িক। তা হল বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ তথা নব্বই-এর দশকের শুরুর সময়। WTO-এর বাণিজ্যচুক্তি বিভিন্ন সদস্য দেশগুলির মধ্যে মূলত চৌদ্দটি বিষয়ে সম্পাদিত হয়েছিল। কৃষি তাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা সকলেই জানি কৃষিক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতির বৃহত্তম ক্ষেত্র—তা সে জাতীয় আয়ের নিরিখেই হোক বা কর্মসংস্থানের নিরিখেই হোক। তাই এই প্রাথমিক ক্ষেত্রের ওপর বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির প্রভাব (যাকে এককথায় বিশ্বায়নের প্রভাবও বলা যেতে পারে) অন্তর ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপরিসীম।

ভারতীয় কৃষি বরাবরই বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত। এমনকী স্বাধীনতা-উত্তর কালে যখন কেন্দ্রমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তখনও কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানা বজায় ছিল। সোজা ভাষায় বলতে গেলে জমি বরাবরই চাষিরা। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মালিকানা ছিল না। কিন্তু তা বলে তার হস্তক্ষেপ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। উদাহরণস্বরূপ ফসলের নিয়ন্ত্রণ মূল্য (Administered Price), ফসল পরিবহনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও কৃষিঋণ ব্যবস্থা ও কৃষি বিপণন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেসরকারি সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সরকার কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপাদান ও উপকরণ

সমূহের উপর প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ভর্তূকি দিত (সে প্রথা এখনও বলবৎ)। ভারতীয় রপ্তানির সিংহভাগ বরাবরই কৃষিজাত পণ্যের অধিকারে। এই কৃষিপণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যও বিভিন্ন আধাসরকারি সংস্থার পরিচালনাধীন। সুতরাং ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে যে সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছিল একথা জোর দিয়ে বলা যায়। যেহেতু বেসরকারিকরণ কখনোই কৃষিক্ষেত্রে কোনো ইস্যু ছিল না। তাই সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল একান্তই নীতিগত। ১৯৯১ সালে নব অর্থনৈতিক নীতির সূচনাতেই তাই কিছু নীতিগত পরিবর্তনের সূচনা করা হয়। উক্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলি হল নিয়ন্ত্রিত মূল্য পদ্ধতির পরিবর্তন, কৃষিপণ্যের আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের ও কোটার বিনাশ। উপকরণ ভর্তূকির অবসান এবং কৃষিপণ্যের বিঅঞ্চলিকরণ (Dezoning)।

এছাড়া আরও কিছু সংস্কারমুখী কর্মসূচি নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে ভারতীয় কৃষির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সেগুলির ক্ষেত্র হলো বীজ উৎপাদন, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা, খুচরো কৃষি উপাদান বিপণনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথার বিলোপ সাধন এবং বেসরকারিকরণ প্রভৃতি।

জলসেচের কথা আলোচনা না করলে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নীট সেচভুক্ত এলাকা ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও দেশের সেচ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রান্তর ঘটেছে। তা হল খালসেচ থেকে কূপসেচে ক্ষেত্রান্তর। এই ক্ষেত্রান্তর পক্ষান্তরে জলসেচের ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণেরই বার্তাবহ। কূপসেচের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ষনাবেক্ষণের খরচ ও তৎসম্পর্কিত বিনিয়োগের বোঝা কৃষককে বহন করতে হয়। খালসেচের ক্ষেত্রে তা প্রায় নেই বললেই চলে। একারণে খালসেচভুক্ত এলাকার কৃষকরা আর্থিকভাবে সবচেয়ে লাভবান হয়। যেহেতু খালকাটা ও সংস্কারের কাজ সরকারকেই করতে হয়, সেহেতু এটা বলা যেতেই পারে যেসেচের জন্য সরকারি বিনিয়োগ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়। আবার কূপসেচের প্রসারের সুযোগ কেবলমাত্র আর্থিকভাবে সচ্ছল কৃষকশ্রেণিই গ্রহণ করতে পারে, কারণ এই প্রকার সেচপদ্ধতি একান্তভাবেই মূলধন-নিবিড়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এই যে বহুপার্শ্বিক বাণিজ্যের যুগ, তা শুরু থেকেই একান্তভাবে রপ্তানি-নির্ভর। সে জন্য ভারতের কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রগত পরিবর্তনের সূচনা বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের শুরু থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিবর্তন হল খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমিয়ে রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো। ১৯৯০-৯১ সাল থেকে ১৯৯৭-৯৮ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে রেকর্ড পরিমাণ তৈলবীজ উৎপাদিত হয়েছিল। শ্লাঘার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শ্লাঘার মধ্যে লজ্জাও লুকিয়ে ছিল। ১৯৭৫ সালের পর ঐ সময় সর্বপ্রথম সমগ্র দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভারতের অসংখ্য ছোট ছোট প্রান্তির চাষির পক্ষে বাণিজ্যশস্য উৎপাদনের বিপুল বিনিয়োগের বোঝা বওয়া কখনোই সম্ভব নয়, তাই নিদ্বিধায় বলা যেতে পারে যে রপ্তানি নির্ভর বাণিজ্য চুক্তির সুফল কেবলমাত্র আর্থিকভাবে সচ্ছল বৃহৎ জোতের মালিকরাই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশ হিসেবে ভারত যে-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, সেই চুক্তির ফলে দেশের কৃষিক্ষেত্রে যে-সমস্ত সংস্কারমুখী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, সেই সমস্ত পরিবর্তনের অর্থনৈতিক সুফল ছিল না। ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ সালে GATT কে সরিয়ে WTO-র আবির্ভাব। দেখা যাক, তার পাঁচবছর পরে অর্থাৎ ২০০০ সাল নাগাদ ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রের চিত্রটা ঠিক কীরকম।

২০০০ সালে নতুন দিল্লীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কৃষক সংগঠন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে ভারতীয় কৃষি মন্ত্রকের একটি আলোচনা সভা হয় (শর্মা, ২০০০)। সেই সভায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের মুখপাত্র স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, স্বচ্ছ দক্ষ এবং বাজারভিত্তিক যে ব্যবস্থা কৃষি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল তা যথেষ্ট আশা জাগাতে পারেনি। তিনটে মূল যে-বিষয়ে কৃষিক্ষেত্রে WTO চুক্তি সাধিত হয়েছিল সেই বিষয়গুলি হলো অভ্যন্তরীণ সমর্থন (Domestic Support), রপ্তানি ভর্তূকি (Export Subsidy) এবং বাজারের প্রাপ্যতা (Market Access)। মারাকাশ চুক্তির পাঁচবছর পর এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিলো যে উপরিউক্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে উন্নত দেশগুলির কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর বিষয়গুলি যথা আমদানি শুল্ক, রপ্তানি ভর্তূকি এবং অভ্যন্তরীন সমর্থনের প্রসঙ্গে আসা যাক। চিনি, ডেয়ারি ও দুগ্ধজাত পণ্য, দানাশস্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির দ্বারা আরোপিত আমদানি শুল্ক বেশ বেশি। অথচ ভারতকে ১ এপ্রিল, ২০০০ সালের মধ্যে সমস্ত কৃষিপণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে কোটা তুলে নিতে বলা হয়েছিল। আমেরিকাতে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিভিন্ন রকম কৃষিপণ্যের দামের ওপর ভর্তূকি প্রায় ৭০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার ঐ সময় আমেরিকার কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিল। সেখানে ১৯৯৮ সালে ভারত সরকার দেশের ৫৫০ মিলিয়ন কৃষককে কেবলমাত্র ১ বিলিয়ন ডলার পরোক্ষ ভর্তূকি হিসেবে বণ্টন করেছিল।

এবার ভারতের কৃষিপণ্য আমদানির চিত্রটা পর্যালোচনা করা যাক। ২০০০-০১ সালে ১.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য ভারতে আমদানি করা হয়েছিল যা ২০০১-০২ সালে বেড়ে ২.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে ভারত ঐ সময় ঐ আমদানির বন্যাকে শুল্কের দেওয়াল তুলে সহজেই আটকাতে পারত। এর সমর্থনে ভারত পেত WTO-র দ্বারা অনুমিত শুল্কের হারকে, যার হার, এমনিতেই যথেষ্ট বেশি। ২০০১-০২ সালে এবং ঠিক পরবর্তী ২০০২-০৩ সালের আর্থিক বাজেটে চা, কফি, ভোজ্য তেল, প্রাকৃতিক রাবার, কার্ডামম প্রভৃতি পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানোও হয়েছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ঐ সময় উন্নত ও উন্নতিশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শুল্ক লড়াই শুরু হলে তা বিশ্বায়ন তথা বহুপার্শ্বিক বাণিজ্য চুক্তির মূল সুর ঠিকই নষ্ট করে দিত।

২০০১ সালে নভেম্বর মাস অনুষ্ঠিত দোহা মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি কথা দিয়েছিল যে তারা কৃষিপণ্যের রপ্তানি ভূর্তুকি, আমদানি শুল্ক এবং অভ্যন্তরীণ আর্থিক সমর্থন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনবে।

কিন্তু ২০০৩ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে তারা কোনো ক্ষেত্রেই তাদের দেওয়া কথা রাখেনি। ২০০৬ সালের WTO-র হংকং মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে উপরিউক্ত বিষয়গুলি অর্থাৎ শুল্ক, ভর্তূকি, সমর্থনমূলক দাম প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যেকার দীর্ঘদিনের মতবিরোধ তথা সংঘর্ষের একটা স্থায়ী সমাধান খোঁজের চেষ্টা হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল যে এখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যে কিনা সর্ববৃহৎ কৃষিভর্তূকি প্রদানকারী হিসেবে পরিচিত, ২০১৩ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের ওপর রপ্তানি ভর্তূকি সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। তবে শর্তসাপেক্ষে। শর্ত এই যে ২০০৬ সালের শেষে WTO-র দোহা রাউণ্ডের পূর্বনির্দিষ্ট সমাপ্তির পরই ভর্তূকি অবসানের চুক্তিটি কার্যকর হবে। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে WTO-র বহুপার্শ্বিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর অন্তত কৃষিক্ষেত্রে ভারতের তথা সমগ্র উপমহাদেশের লাভবান হওয়া অনেকটাই ভারসাম্যের এবং শর্তের খেলায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়।

ভারতের কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃত বিনিয়োগ বিগত কয়েক বছরে বেড়েই চলেছে। ২০০৪-০৫ অর্থবর্ষে ২৭৬৭.৪২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে হয়েছিল ১৪১৬৫.২৪ কোটি টাকা। মাঝে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে তা ছিল ১০৮৭০.১৫ কোটি টাকা। ঐ একই সময়কালের মধ্যে ভারতের কৃষিরপ্তানি ৪১৬০২.৬৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৩০১৪১.১৩ কোটি টাকা। সুতরাং বাণিজ্যক্ষেত্র হিসেবে ভারতীয় কৃষির গুরুত্ব ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

আসলে কৃষিক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত আর্থিক ভর্তূকির মতো সংবেদনশীল ইস্যুটিকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত WTO-র উন্নত ও উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলি কোনোরকম ঐক্যমত্যে আসতে পারেনি। আর্থিকভাবে উন্নত সদস্য দেশগুলি তাদের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে Blue Boxএবং Green Box ভর্তূকি দিয়ে যাবে আর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিকে চাপ দেবে যে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্তরকম কৃষিভর্তূকি তুলে নিক, এই দ্বিচারিতা ভারতসহ অনেক সদস্য দেশ মেনে নিতে পারছে না। এর অন্যতম কারণ ভারতের মতো জনবহুল অথচ কৃষিনির্ভর দেশকে তার খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। সেই কারণেই ভারতের তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীকমল নাথ WTO-র বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মতো উন্নত সদস্য দেশগুলি কৃষিভর্তূকি ইস্যুতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সমর্থন করে চলেছে। ৩১ জুলাই, ২০১৪-য় জেনেভাতে অনুষ্ঠিত WTO-র শেষ বৈঠকে, ভারত TFA (Trade Facilitation Agreement) বলবৎ করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। এর প্রধান কারণ, এই চুক্তিতে ১৯৮৬-৮৮ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে কৃষিভর্তূকির হিসেবের প্রস্তাব আছে। সেক্ষেত্রে এত বছরের খাদ্যমুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানাম ভর্তূকির আর্থিক হিসেবকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জমানায় ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ওপর প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment বা সংক্ষেপে FDI), WTO-র গঠনতন্ত্রে দুটি মুল চুক্তির ওপর নির্ভর করে কাজ করা হয়। এগুলি হলো যথাক্রমে General Agreement on Trade in Services বা সংক্ষী GATS এবং Trade-Related Investment Measures বা সংক্ষেপে TRIMS। এই দুটি বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা অন্য কোথাও করা যেতে পারে, তবে একথা বলা যেতে পারে যেভারত, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ক্ষেত্রে TRIMS-এর উপস্থিতি বেশ প্রবল। ভারতের অর্থনীতি ও GATS নিয়ে এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

একথা সবাই মোটামুটি ভাবে অবহিত যে WTO-র জন্মকাল ও ভারতের অর্থনীতির উদারীকরণকাল প্রায় সমসাময়িক। যেহেতু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বহুপার্শ্বিক পরবর্তী প্রভাব হিসেবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারণাটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাই ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব দুটি ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। সেই ভাগগুলি হলো যথাক্রমে সংস্থার-পূর্ব যুগে (১৯৯১ সালের আগে)এবং সংস্কার-পরবর্তী যুগে (১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়ে) ভারতের FDI নীতি। প্রথমে উল্লিখিত সময়কাল দুটিতে ভারত সরকারের FDIনীতির মধ্যকার চরিত্রগত পার্থক্যগুলি খেয়াল করে দেখতে হবে।

সংস্কার-পূর্ব ১৯৬৭ এবং ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়টিকে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের সময় বলে চিহ্নিত করা যায়। ঐ সময় বিখ্যাত (কুখ্যাত!) ফেরা আইন (FERA বা Foreign Exchange Regulation Act) ১৯৭৩ সালে বলবৎ হয়েছিল। কেবলমাত্র যে-সমস্ত ক্ষেত্র সরকারের দ্বারা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত ছিল, কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগত দেওয়া-নেওয়া এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ স্বীকৃত ছিল। শতকরা ৪০ ভাগের বেশি বিদেশি শেয়ার সেই সময় নিষিদ্ধ ছিল।

১৯৮০-র দশকে অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে রপ্তানি বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, কারন ঐসময়ে সরকারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার (বলা ভালো আমেরিকান ডলার) প্রয়োজনীয়তা সাংঘাতিক ছিল। ঐ সময়েই ১০০ শতাংশ রপ্তানি-নির্ভর ইউনিটের ক্ষেত্রে ফেরা আইনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি উৎপাদক অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল। মুলধনী দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে Open General Licence-এর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

১৯৮৬ সালে রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্য আয়ের ক্ষেত্রে করের হার শতকরা ৪০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়।

১৯৯১ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা, ভারতীয় অর্থনীতির ওপর যার প্রভাব ছিল সূদূরপ্রসারী। বিপুল সংখ্যায় ভারতীয় অভিবাসী যারা ঐ অঞ্চলের পুরুষানুক্রমে কর্মরত ছিল এবং উপার্জন করে দেশে টাকা পাঠাতো তারা দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। এর বিরূপ প্রভাব দেশীয় অর্থনীতির ওপর পড়তে শুরু করেছিলো। তার মধ্যে প্রধান ছিলো বৈদেশিক মুদ্রার যোগানে ঘাটতি। এছারা ঐ সময় ভারতের আন্তর্জাতিক ঋণের বাজারে ঋণ হার দ্রুত কমতে থাকে এবং সর্বপ্রথম

বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঋণখেলাপী হবার স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই সময় বিশ্বব্যাঙ্কে ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) ভারতকে আর্থিক সংস্কারের পরামর্শ দেয়।

১৯৯১ সালেই ভারতীয় মুদ্রার ২০ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন ড. মনমোহন সিং। ঐ সময় অনেকগুলি দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানি শিথিল করা হয়েছিল। বড় বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য Foreign Investment Promotion Board (FIPB) গঠিত হয়েছিল।

বৈদেশিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে MRTP আইন অনুযায়ী আগে থেকে অনুমতি বা ছাড়পত্র নেওয়া প্রথা তুলে দেওয়া হয়। যে-সমস্ত দেশীয় শিল্পের বৈদেশিক সংযোগ ছিল তারা বিদেশি ব্রাণ্ড ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিল। ঐ সময় ভারত Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)-র পূর্ণসময়ের সদস্য হয়েছিল, যাতে সমস্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রস্তাব যেগুলি সরকার দ্বারা সবুজ সংকেত প্রাপ্ত হবে, সেগুলি MIGA-র দ্বারা বীমাকৃত হবে।

১৯৯৩ সালেনতুন খনিজনীতি গৃহিত হয়েছিল। খনিজক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের দরজা খুলে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে দেশীয় বেসরকারি কোম্পানি যাদের হাতে ৫০ শতাংশ ও তার অনূর্ধ বৈদেশিক শেয়ার ছিল তারা অংশগ্রহণ করার অধিকারী ছিল। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরের শেষাশেষি পরিবহন এবং শক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হলো। শর্ত এই ছিল যে বৈদেশিক শেয়ারের পরিমাণ কখনোই ১৫০০ কোটি টাকা অতিক্রম করবে না। ঐ সময় পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমতিযোগ্য হয়েছিলো। তবে সেক্ষেত্রে লাইসেন্স আবশ্যিক ছিল।

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমিত হয়েছিল, তবে বৈদেশিক বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ছিল ২৪ শতাংশ। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে FERA আইনকে সরিয়ে FEMA (FEMA বা Foreign Exchange Management Act) বলবৎ করা হলো।

উপরিউক্ত নীতিগত পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের সুফল ভারতীয় অর্থনীতি খুব তাড়াতাড়ি পেতে শুরু করেছিল। ভারত সরকার প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১-১৯৯২ থেকে ২০০২-২০০৩ সালের মধ্যে ভারতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫৫.৫ বিলিয়ন ডলারে। এর মধ্যে ৩০.৩ বিলিয়ন ডলার (৫০.৭ শতাংশ) ছিল প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ। ঐ ৩০.৩ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মধ্যে প্রায় ৪.৮ শতাংশ (২.৬২ বিলিয়ন ডলার) যোগান দিয়েছিল অনাবাসী ভারতীয়রা।

দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯১ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক অনুমিত বিনিয়োগের পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রায় ছিল ২,৮৪,৮১২ কোটি টাকা। সেখানে সম্পূর্ণ বিগত দশকে (১৯৮১-১৯৯০) এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১,২৭৪ কোটি টাকা। কেবলমাত্র ২০০২ সালে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা ২১,২৮৬ কোটি টাকা ছুঁয়েছিল।

আগস্ট, ১৯৯৯ থেকে মার্চ, ২০০২-এর মধ্যে ভারতে মোট যে-পরিমাণ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল তার দ্রব্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগটি নিম্নরূপ। মোট প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ৩৯ শতাংশ এসেছিল মৌলিক দ্রব্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে ১৫.৭ শতাংশ ছিল শক্তিক্ষেত্রে, ১০.৮ শতাংশ ছিল তৈলশোধন শিল্পে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিলো পরিষেবা ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ৩৭ শতাংশ আকৃশট হয়েছিল। মোট অনুমিত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ৭৫ শতাংস এসেছিলো মৌলিক দ্রব্য শিল্পে, মূলধনী দ্রব্য, টেলি যোগাযোগ এবং কম্পিউটার সফ্টওয়ার সেবাক্ষেত্রে, যেগুলো ভারতের অগ্রাধিকার তালিকার ওপরের দিকে ছিল। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের Economic Survey থেকে জানা যাচ্ছে যে, আগস্ট ১৯৯১ থেকে অক্টোবর ১৯৯৬-এর মধ্যে অনুমিত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ১৫.৩ শতাংশ এসেছিল ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে, মূলধনী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এসেছিল ১৩.১ শতাংস এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এসেছিল ৪৯.১ শতাংশ।

এবার ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কোন কোন দেশ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিল তার একটা হিসেব নেওয়া যায়। এব্যাপারে তালিকার একদম ওপরে আছে আমেরিকা। মোট অনুমিত বিনিয়োগের ২০.৪ শতাংশ এসেছিল ঐ দেশ থেকে। প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবেশের শতকরা অংশ ছিল ১০.৯। দ্বিতীয় স্থানে ছিল কর ছাড়ের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাত মরিশাস। মোট অনুমিত বিনিয়োগের ১১.৯ শতাংশ এসেছিল মরিশাস থেকে। প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের হার ছিল ১৭.৫ শতাংশ। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উৎসস্থান ছিল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা অনাবাসী ভারতীয়রা। তারা মোট অনুপ্রবিষ্ট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ৯.৭ শতাংশ অধিকার করেছিল।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কার-পরবর্তী যুগে ভারত সরকার নীতিগত পরিবর্তনের পথ গ্রহণ করে দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য-অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে। এর ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুপ্রবেশ বাড়ছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে একান্ত জরুরি; কারণ এই ধরনের বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে কেবলমাত্র বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের প্রবেশ ঘটায় তাই নয়, এর ফলে কারিগরি উৎকর্ষ, মান এবং দেশজ শিল্পে প্রতিযোগিতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সমস্যার কথা নিচে আলোচনা করা হলো।

বহুগোত্র পণ্যসমূহের (Multi brand) খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে। এই ইস্যুটি বর্তমানে রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার বহুগোত্র পণ্যসমূহের খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ ও একগোত্র পণ্যের (Single brand) ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিয়েছে। যে-সমস্ত শহরে ১০ লক্ষ বা তার বেশি লোক বসবাস করে কেবলমাত্র সেইসব শহরের ক্ষেত্রেই এই অনুমতি প্রযোজ্য হবে। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য এই আইনের পক্ষে সায় দেয়।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ সহ কিছু রাজ্য এর বিপক্ষে আসরে নামে। এই ধরনের সহমতের অভাব ভারতে মোট FDI-এর অনুপ্রবেশকে ঋণাত্মক ভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুপ্রবেশকে বিপুলভাবে ব্যাহত করেছিল। ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ভারতে মোট FDI অনুপ্রবেশ ৩.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৪০.৪ বিলিয়ন ডলার হয়েচিল। ২০০৯ সালেই তা কমে দাঁড়ায় ৩৪.৬ বিলিয়ন ডলারে। ২০১০ সালে তা ছিল আরও কম, মাত্র ২৩.৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক (-৩২ শতাংশ)।

২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পরেও কিন্তু ব্রাজিল, রাশিয়া বা চীনে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুপ্রবেশের বার্ষিক হার ধনাত্মক ছিল। সুতরাং আর্থিক সংকট ছাড়াও ভারতের নিজস্ব কিছু অসুবিধা আছে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু প্রথাগত বাধা ভারতে FDI অনুপ্রবেশের পথে এতদিন দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই বাধাগুলি আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত হয়ে আছে। যেমন নির্মাণ শিল্প, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, লটারি, ক্যাসিনো ইত্যাদি ব্যবসায়, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, রেল যোগাযোগ, Multi brand খুচরো ব্যবসায় ভারত কোনোরকম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুপ্রবেশের অনুমতি এতদিন দেয়নি। অতি সম্প্রতি ভারত সরকারের শিল্পনীতি ও প্রসারমন্ত্রক প্রতিরক্ষাগত উৎপাদন ও বহুগোত্র পণ্যসমুহের (Multi brand) খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে, সীমিত দায় অংশীদারিত্বে (Limited Liability Partnership) নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিয়েছে।

মেধাস্বত্ব ও ভারতীয় পেটেন্ট আইন

গ্যাট এর উরুগুয়ে রাউণ্ডে বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্বের (Trade Related Intellectual Property Rights বা সংক্ষেপে TRIPS) ধারণাটি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হওয়ার পর তা ভারতে বিপুল পরিমাণ বিতর্কের সূচনা করে। এই বিতর্কের জেরে ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০-এর পর দু-দুবার সংশোধিত হয়। একবার হয় ১৯৯৯ সালে এবং আরেকবার হয় ২০০২ সালে। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে পেটেন্ট আইন তৃতীয়বার সংশোধিত হয়। পেটেন্ট আইনের সংশোধন ও পরিমার্জন নিয়ে একটু পরে আলোচনায় আসছি। তার আগে ভারতে মেধাস্বত্বের প্রয়োগ এবং তার মাধ্যমে বাণিজ্যভিত্তিক লাভ ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে দেশব্যাপী যে-বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের প্রথমভাগে, সেই বিতর্কের প্রধান প্রধান ইস্যুগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক।

বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব বা ট্রিপ্স-এর ক্ষেত্রে ডাঙ্কেল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে বিভিন্ন বিষয়ে পেটেন্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত কিছু বিশেষ ছাড় পাবে। এই ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের দাবি। কিন্তু ডাঙ্কেল প্রস্তাবে ঐ বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র কিছু 'সর্বাপেক্ষা অনুন্নত' দেশের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছিল, যে-গোষ্ঠীভুক্ত দেশ হিসেবে ভারত ছিল না। এছাড়া অন্যান্য অনুন্নত দেশকে যে-সমস্ত ছাড়ের কথা ঘোষিত হয়েছিল সেগুলি একান্ত সাময়িক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ভারত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রক ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল যে, চীন, ১৯৮৬ সাল অবধি ওষুধ শিল্পে যে-সমস্ত পণ্য পেটেন্ট আমেরিকাতে নেওয়া হয়েছিল সেগুলির পেটেন্টগত নিরাপত্তা তাদের দেশে (চীনে) অনুমোদন করেছিল। কিন্তু সমালোচকদের মতে ঐ উদাহরণ দেখে ভারতের উৎসাহিত হওয়ার কিছু ছিল না। তার কারণ আমেরিকার সঙ্গে ঐ সময় চীনের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ছিল এবং চীনের একটি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ছিল, যার কোনোটাই ভারতের ছিল না। বরং ভারতে ওষুধ শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন প্রায় পুরোটাই বেসরকারি মালিকানাধীন ছিল বা এখনো আছে। আরও একটা কথার এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উৎপাদন ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ওষুধশিল্পে ভারত, চীনের তুলনায় অনেক সুবিধেজনক অবস্থায় ছিল। তাই ঐ শিল্পে পণ্য পেটেন্ট মেনে নিলে চীনের তুলনায় ভারতের অনেক বেশী ক্ষতি হবে তা অস্বীকার করার উপায় তখন ছিল না।

১৯৭০ সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইন অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী, ভেটেরিনারি পণ্য, কৃষিরাসায়নিক পণ্য, খাদ্যদ্রব্য, সংকর ধাতু, অপটিক্যাল কাচ, সেমিকন্ডাক্টার এবং আরও কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্য পেটেন্ট নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়াও পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে কোনোরকম আবিষ্কার বা অগ্রগতির জন্য ভারতে কোনোরকম পেটেন্টের আবেদন গৃহীত হতো না। এই সমস্ত অগ্রাহ্য করে ডাঙ্কেল ড্রাফটের ২৭.৭ ধারা অনুযায়ী কোনোরকম দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে পেটেন্টরদের বা অ-অনুমোদনের অধিকারকে বাতিল করা হয়েছিল। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, যে কোনো আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পণ্য-সংক্রান্ত পেটেন্ট বা পদ্ধতিগত পেটেন্ট পাওয়া বা অনুমোদন করা আবশ্যিক।

বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপের মতে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষত বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্বের নিরাপত্তার জন্য ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের যথাযথ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ছিল। যদিও ঐ সময়ে পেটেন্ট আইনের ন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপের মতে TRIPS চুক্তির দিকে মনোযোগ সহকারে নজর দিলে দেখা যেত যে কৃষকের বীজ সংরক্ষণের অধিকারটি তাৎক্ষণিক বিপদের সম্মুখীন ছিল না এবং এর জন্য খুব একটা সাহসী লড়াই-এর তখন কোনো প্রয়োজন ছিল না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ঐ সময় অনুন্নত দেসগুলি সমস্বরে উন্নত দেশগুলির একটি অদ্ভুত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। প্রস্তাবটি হলো যে, কোনো দ্রব্য আমদানি করলেই ঐ দ্রব্যের পেটেন্ট কার্যকরী করা যাবে। অনুন্নত দেশগুলি (ভারত তাদের একটি) প্রতিবাদের সঙ্গে দাবি জানিয়েছিল যে TRIPS সংক্রান্ত আলোচনায় WTO-র উচিত পণ্যের মালিক ও সরকারের মধ্যে অবস্থিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। যদিও ডাঙ্কেল প্রস্তাবের ২৮.১ (এ) নং ধারায় বলা ছিল যে আমদানির অনুমতি প্রদান পেটেন্ট মালিকের একান্ত অধিকার। অর্থাৎ পেটেন্ট অধিকারীর অনুমতি ছাড়া কোনো সরকার

একজন তৃতীয় পক্ষকে ঐ দ্রব্য বা পদ্ধতি অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানির অনুমতি দিতে পারে না, যে দেশে আলোচ্য দ্রব্য বা সেবার সুফল জনগণ আইনানুগভাবে ইতোমধ্যেই পাচ্ছে।

WTO-র সদস্য হিসেবে ভারত যখন ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে TRIPS সংক্রান্ত বহুপার্শ্বিক বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিল তখন উপরোক্ত বিতর্ক ও সন্দেহের বাতাবরণ প্রেক্ষাপটে ছিল। উপরন্তু ঐ চুক্তির জন্য সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারকে ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনকে ১৯৯৯ সালে সংশোধন করতে হয়। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে পেটেন্টের আইনসংক্রান্ত দ্বিতীয় একটি বিল পার্লামেন্ট নিয়ে আসা হয়। ২০০২ সালের ঐ বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরে আইনে পরিণত হয়। এইভাবে প্রায় ৭ বছরের মধ্যে WTO-র চুক্তির ফলে ভারতকে দু-দুবার তার পেটেন্ট বা মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত আইনটিকে সংশোধন করতে হয়।

উপরোক্ত সংশোধিত আইনবলে পেটেন্ট মালিক তাদের অধিকার সুরক্ষার অধিকার পায়। পেটেন্ট অধিকারীর অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে তার আবিষ্কৃত পণ্য বা পদ্ধতি কোনোটাই ভারতের মাটিতে ব্যবহার বা বিক্রি করা যাবে না, এমনকী অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানিও করা যাবে না। পেটেন্টের আবেদনের দিন থেকে আগামী ২০ বছর পর্যন্ত পেটেন্টের আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হয়েছিল, যা ১৯৭০ সালের আইনের তুলনায় (১৪ বছর) অনেকটাই বেশি। এছাড়াও TRIPS চুক্তির শর্ত মেনে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অধিকার রদ করার সিদ্ধান্ত সংশোধিত আইনে নেওয়া হয়। সেগুলি হল পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক দ্রব্যসামগ্রী, মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-সংক্রান্ত গবেষণা, নির্ণয়, চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসার পদ্ধতি প্রভৃতি। নতুন আইনে কেন্দ্রীয় সরকার বা সরকার নিয়োজিত কেউ বা কোনো সংস্থা যে কোনো আবিষ্কারের অধিকার নিতে পারে, যদি ঐ আবিষ্কার জাতির স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়। তবে এক্ষেত্রে আবিষ্কর্তা বা পেটেন্ট অধিকারীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ দিতে সরকার বাধ্য থাকবে (ধারা ৯৯ থেকে ১০৩)। তবে ঐ আবিষ্কারের সুফল সরকার বা অন্য অধিগ্রহণকারী ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার বা বিক্রি করতে পারবে না। এছাড়াও TRIPS চুক্তির ৩৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের নতুন পেটেন্ট আইনের একটি নতুন ধারা (১০৪ এ) যোগ করা হয়েছিল। ঐ ধারা অনুযায়ী পেটেন্ট আইন লঙ্ঘনকারীকেই তার নির্দোষিতার প্রমাণ দাখিল করতে হবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে ১৯৯৯ ও ২০০২ সালের পেটেন্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে উদ্ভাবক এবং উদ্ভাবিত উভয়েরই স্বার্থ সুরক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এর ফলে TRIPS চুক্তির যেটা মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী মেধাত দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের বাণিজ্যিক বিস্তার ও ঐ বিস্তারের মাধ্যমে সমাজের মঙ্গলসাধন, তা ভারত এবং এই উপমহাদেশে সাফল্যের মুখ দেখাবে আশা করা যায়।

ভারতের পেটেন্ট আইন তৃতীয় বারের জন্য সংশোধিত হলো ২০০৫ সালে। এই সংশোধন মূলত ওষুধ ও জৈব রাসায়নিক শিল্পের কথা মাথায় রেখে। TRIPS চুক্তি অনুযায়ী এই দুই শিল্পে পণ্যসংক্রান্ত পেটেন্ট চালু করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কাছে শেষ সময় ছিল ১ জানুয়ারি, ২০০৫। সেই জন্য ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি জরুরি আদেশ জারি করেছিল। ঐ আদেশ পরবর্তী ৭৪টি সংশোধনের মাধ্যমে পেটেন্ট আইন, ২০০৫-এ পরিণত হয়।

উপরোক্ত আইনটি প্রণীত হওয়ার ফলে দেখা গেল যে সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। আবার বেশ কিছু স্ববিরোধিতা ও অস্বচ্ছতাও আছে। পেটেন্ট আইন, ২০০৫-এ রাসায়নিক দ্রব্যের 'চির সবুজায়ন' (ever greening) -এর ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ পেটেন্ট পেতে গেলে নতুন রাসায়নিক উপকরণের আবিষ্কার করতে হবে। ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত কোনো রাসায়নিক উপকরণের যৎসামান্য হেরফের ঘটিয়ে নতুন আবিষ্কার বলে চালানোর পদ্ধতিকেই 'চির সবুজায়ন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ পথ বন্ধ না হলে নতুন ও উন্নত ধরনের ওষুধপত্র পাওয়া ভবিষ্যতে দুষ্কর হয়ে উঠবে। ২০০৫ সালের আইনে ঐ উদ্দেশ্যে ২নং সেকশানে তিনটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সেগুলি হল আবিষ্কারগত পদক্ষেপ (Inventive Step), নতুন আবিষ্কার (New Invention) এবং ওষধিগত অস্তিত্ব (Pharmaceutical Substance)। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয়ের যে সমস্ত সংজ্ঞা নতুন আইনে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বেশ অস্বচ্ছ ও দুর্বোধ্য। ঐ সমস্ত সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে রাসায়নিক উপকরণসমুহের 'চির সবুজায়ন'কে উৎসাহিত করবে।

পেটেন্ট আইনের তৃতীয় সংশোধনে, অনুমোদনের আগে বিশেষ কোনো পেটেন্ট আবেদনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর রাস্তা খোলা হয়েছে। অবশ্য ঐ চ্যালেঞ্জের বা প্রতিবাদের নির্দিষ্ট ভিত্তি থাকতে হবে। তবে ঐ প্রতিবাদের কার্যকারিতা পেতে গেলে প্রতিবাদপত্রটিকে পেটেন্ট অফিসার বাক্সে পৌঁছতে হবে। কারণ প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, কেবলমাত্র সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে তা ভেঙে যেতে পারে। আরেকটি বিষয়ে ২০০৫ সালের পেটেন্ট বিল খুব একটা সন্তোষজনক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তা হল আবশ্যিক লাইসেন্স (Compulsory Licence)। পেটেন্ট প্রদানের দিন থেকে তিন বছরের ব্যবধানে আবশ্যিক লাইসেন্স দেওয়া যাবে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে জাতীয় জরুরী অবস্থা, জনহিতার্থে অব্যবসায়িক ব্যবহারে। কিন্তু ২০০৫ সালে প্রণীত আইন ঐ প্রকার লাইসেন্স প্রদানের স্পষ্ট এবং কার্যকরী কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

TRIPS-এর সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে চীন, জাপান বা আমেরিকার চেয়ে ভারত এমনিতেই অনেক পিছিয়ে। ২০০৭ সালের হিসেব অনুযায়ী সারা বিশ্বের মোট পেটেন্ট গ্রহণের শতকরা ৫৯.২ অংশ উপরোক্ত তিনটি দেশের মধ্যে থেকেছে। ঐ একই সময়ে ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে মোট বিক্রয়ের শতকরা হিসেবে যা ব্যয় হয়েছিল, তা ভারতে ছিল মাত্র ১.৮ শতাংশ যা USA-তে ছিল ১৬ শতাংশ। ভারতে বহুকাল থেকেই জীবনদায়ী ওষুধের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে আছে, যা WTO-চুক্তির পরিপন্থী। TRIPS চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৪৭টি ওষুধের মধ্যে মাত্র ৭৬টি ওষুধ এখনো নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়নি।

বাণিজ্যমুখী মেধাস্বত্ব তথা TRIPS সংক্রান্ত বিশয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি সম্পাদন ও সেই সুবাদে ভারতের অভ্যন্তরীণ পেটেন্ট আইনের বিভিন্ন ধারায় একাধিক কর সংশোধন সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে বাসমতী ও নিমের পেটেন্ট সংক্রান্ত ঘটনাবলীর কথা মাথায় রাখলে বলা যায় যে আবিষ্কারের পেটেন্ট বা সম্পদের পেটেন্ট সংক্রান্ত আইন যদি আবিষ্কর্তা বা রাষ্ট্রের স্বার্থবাহী না হয় তাহলে ঐ সম্পর্কিত বহুপার্শ্বিক বাণিজ্য চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আশা রাখা যায় ভারতের সংশোধিত পেটেন্ট আইনের মাধ্যমে দেশ ভবিষ্যতে তার অতুল প্রাকৃতিক ও মানবিক ঐশ্বর্য ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে। তার সেক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অসুবিধার কথাগুলিও মাথায় রাখতে হবে।

পরিষেবা ক্ষেত্রে বাণিজ্যচুক্তি ও ভারতের উচ্চশিক্ষা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন যেক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করে চলে তা হল শিক্ষা। এখানে কে কাকে অনুসরণ করে বলা মুশকিল। ভারতে তথা সমগ্র প্রাচ্যে শিক্ষাকে একটি পবিত্র অঙ্গন হিসেবে ধরা হয়। এই অঙ্গনও যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হিসেবে ভাবা যেতে পারে তা জানা গেল WTO আসার পরে। শিক্ষাকে পরিষেবা হিসেব বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ধারণাটি একেবারে ভারতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে গেছে, যেদিন থেকে WTO চুক্তির মাধ্যমে General Agreement on Trade in Services বা GATS-এর অবতারণা ঘটেছে।

১৯৯৬ সালে WTO-র বৈঠকে বিশ্ব-অর্থনীতি পরিপ্রেক্ষিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। সেখানেই সদস্য দেশগুলি গ্যাটস-এর চুক্তিতে সই করে এবং ঐ চুক্তির মাধ্যমে পরিষেবার ক্ষেত্রে বহুপাশ্বিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে একাসনে বসায়। পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে স্বচ্ছ ও সমমানের বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো গঠনের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যেই GATS-এর প্রতিষ্ঠা। এই পরিষেবা, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষেবা, উচ্চ শিক্ষা পরিষেবা, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য শিক্ষা পরিষেবা এবং অন্যান্য শিক্ষা পরিষেবা। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হিসেবে এখানে কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে গ্যাটস্-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলাম।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বায়ন অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয় হলেও ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণ অনেক আগেই ঘটেছিল। তার জন্য নালন্দা এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। সেই প্রাচীন যুগে দূরপ্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাব ও জ্ঞানের আদান-প্রদান ভারতীয় শিক্ষা, চিন্তা ও মননের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু শিক্ষা বা জ্ঞান সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিযোগে পরিষেবা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, আজকের WTO-র যুগে বা বিশ্বায়নের যুগে যা হতে চলেছে। এক্ষেত্রে বাজারকেই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে। বাজারকে শিক্ষা-ক্ষেত্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধরলে দুধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত কেবলমাত্র বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ পণ্যের (Public goods) যোগান সম্ভব নয়। মুনাফা-সন্ধানী বাজার শিক্ষার মানকে অবহেলা করতে পারে। উন্নতিশীল দেশে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা একান্তভাবে জরুরি। দ্বিতীয়ত বাজার সমাজের সমস্ত অংশকে শিক্ষার আলোয় আনতে অপরাগ। এক্ষেত্রে সরকারকে একজন নির্দেশক, নিয়ন্ত্রক এবং সর্বোপরি পথপ্রদর্শক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

এবার ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রের বিস্তারের দিকে একবার নজর দেওয়া যাক। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ধারক ও বাহক হলো ভারতবর্ষ। ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩০০০ কলেজ এবং প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা সহযোগে গঠিত আমাদের এই উচ্চশিক্ষাক্ষেত্র। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮ মিলিয়ন। এই ক্ষেত্রে সরকার হচ্ছে প্রধান আর্থিক সহায়ক। যদিও পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, বেশকিছু বিদেশি বিস্ববিদ্যালয় এই বিশাল শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিক অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। ২০০০ সালের সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ৬ মাসের মধ্যে দেশের চৌদ্দটি প্রধান দৈনিক প্রায় ১৫টি দেশ থেকে আগত ১৪৪টি পরিষেবা প্রদানকারী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এক্ষেত্রে তার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিং-এর জন্য ডেকেছিল। অনেকেই ভারতে তাদের ক্যাম্পাস খুলেছিল বা খুলতে চলেছিল। এছাড়াও তাদের স্ব স্ব দেশের ক্যাম্পাসেও যোগ্য ভারতিয় ছাত্রদের প্রতি যথাযোগ্য আহ্বান ছিল। WTO চুক্তি অনুযায়ী ভারতও পারে তার উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিষেবা রপ্তানি করতে ও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে।

ভারতে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি আন্তর্জাতিক মানের। যেমন Indian Institute of Technology (IIT), Indian Institute of Management (IIM), ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত Indian Institute of Science (IIS), কলকাতাতে অবস্থিত Indian Statistical Institute (ISI) প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথিবীর যে কোনো উন্নত মেধাবী ছাত্রদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম বা যে কোনো দেশে তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে দাবিদার হতে পারে। এছাড়াও যে সমস্ত বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতে শিক্ষা পরিশেবার বাণিজ্য করতে আসছে তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা চুক্তি বাবদ নিয়ে ভারত তার নিজস্ব জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে পারে। সর্বোপরি দেশি, বিদেশি বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকলে ছাত্রসমাজ সার্বিকভাবে লাভবান হবে বইকি।

কিন্তু সন্দেহের মেঘও ভালভাবেই জমেছে। WTO-র সমালোচকরা শিক্ষাক্ষেত্রে GATS-এর ভূমিকাকে মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁদের মতে পুরো উদ্যোগটাই বাণিজ্যের স্বার্থে এবং প্রথম বিশ্বের স্বার্থে এব্যাপারে তাঁদেরও কিছু নিজস্ব যুক্তি আছে। তাঁরা বলছেন যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বার্ষিক বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যীকরণের

মাধ্যমে। এই বাজার দখল করতে প্রথম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আগ্রহী। আরও কিছু তাঁরা বলছেন। যেমন বলছেন উন্নত দেশগুলিতে জন্মহার কমেছে। সেইজন্য ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়েসি জনসংখ্যা ঐ দেশগুলিতে ক্রমহ্রাসমান, সোজা কথায় উচ্চশিক্ষায় ছাত্রের যোগান অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। সেজন্যে জনবহুল তৃতীয় বিশ্বের প্রতিভাবান ছাত্রসমাজের দিকে নেকনজর পড়েছে। সেই উদ্দেশ্যে GATS-এর অবতারণা। এদিকে উচ্চশিক্ষায় রাষ্ট্রীয় সাহায্যের হাত উন্নত দেশগুলিতে বরাবরই দরাজ ছিল। সেই দরাজ হাত অধুনা গুটিয়ে আসছে। সরকারি সাহায্য ক্রমশ কমছে। ভর্তুকি কমছে। সেই ক্ষতি পূরণ করতে নিজেদের দেশের উন্নত উচ্চশিক্ষার বাজার উন্নতিশীল দেশগুলির সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

উচ্চশিক্ষার বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ও স্বীকৃতির প্রশ্ন। দেশের বাজার বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে খুলে দেবার আগে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও স্বীকৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া দরকার। GATS-এর ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে এই ব্যাপারে অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোনো সদস্য দেশের উচিত বৈদেশিক শিক্ষাপরিষেবাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। আরো বলা হয়েছে যে, কোনো সদস্য দেশের সরকার যখন কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা পরিষেবাকে প্রভাবিত করতে পারে, তখন ঐ সরকারের উচিত তারই সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষভাবে পুনর্বিবেচনার সুযোগ করে দেওয়া। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কোনো ক্ষেত্রে এমন হওয়া উচিত নয় যার দ্বারা উচ্চশিক্ষা পরিষেবার মুক্তবাণিজ্য ব্যাহত হয়।

এবার আশা যাক স্বীকৃতির প্রশ্নে। GATS-এর সমস্ত অনুচ্ছেদে এব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত যখন কোনো দেশে কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করতে আসছে তখন ঐ দেশের যথাযথ স্বীকৃতির প্রক্রিয়া থাকা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ ভারতে কোনো বিশেষ বিদেশি শিক্ষাক্রমকে National Assessment and Accreditation Council (NAAC)-এর দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে। দ্বিতীয়ত দেশে দেশে উচ্চশিক্ষার মানের ও পরিমাণের বিস্তর ফারাক আছে। দ্বিপাক্ষিক স্বীকৃতির মাধ্যমে দাতা ও গ্রহীতা দেশের শিক্ষার মান ও যোগ্যতার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তৃতীয়ত দুটি শিক্ষা পরিষেবা বিনিময়কারী দেশকে নিজেদের মধ্যে সমঝোতামূলক চুক্তিতে আসতে হবে যে শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির উভয় দেশে যাতায়াত বাধামুক্ত হবে।

ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলিকে GATS নির্ধারিত শিক্ষাবাণিজ্যের প্রকৃতি, সুযোগ এবং বিপদ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে জাতীয় উন্নয়ন উচ্চমানের মানবসম্পদের ওপর নির্ভরশীল, যার ধাত্রীভূমি হচ্ছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও দায়িত্ব থেকে যায়। তাদের নিজেদের দুর্বলতাগুলি মুছে ফেলে আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষামানের উপযুক্ত হতে হবে।

উচ্চশিক্ষার বিশ্বায়নের অর্থ শিক্ষাকে পরিষেবা (Service) হিসাবে গ্রহণ করা। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে বিপুল পরিমাণ মানুষ এখনো প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত, সেখানে ঐ পরিষেবা ধারণার প্রয়োগের কিছু বাস্তব সমস্যা আছে। শিক্ষার বিশ্বায়নের অর্থ শিক্ষা একটি পণ্য, সেখানে বাজার অর্থনীতির প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। যদিও মুষ্টিমেয় কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় শেষ ২৫ বছর ধরে একই কারিকুলাম অনুসরণ করা হচ্ছে, তাও শিক্ষাক্ষেত্রে যত বেশি করে বাজার ব্যবস্থার বিস্তার ঘটবে তত কিছু বিশেষ বিষয় বা ক্ষেত্রের পড়াশুনার চাহিদা বাড়বে যেগুলির বাস্তব চাহিদা বা শ্রমনিয়োগ সম্ভাবনা বেশি। সেই সমস্ত বিষয় অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে (পড়তে) হবে এবং যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে তারাই পড়তে পারবে। মূল্যবান পণ্য হিসাবে উচ্চশিক্ষার এইরূপ বাণিজ্যকরণ ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে (যেখানে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করা হয়) কতটা মঙ্গলজনক তা ভেবে দেখার বিষয়। এছাড়াও এটা বিশেষ চিন্তার বিষয় যে, 'একবিশ্ব' শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রসমাজ তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে ভবিষ্যতে শেকড় উপড়ে ফেলবে বা ফেলতে বাধ্য হবে।

উপসংহার :

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে সমগ্র বিশ্বের একসঙ্গে। এর জন্য সদস্য দেশগুলি যেন এক ছাতার তলায় এসে একত্রে দ্রব্যসামগ্রী ও পরিষেবার ক্ষেত্রে বহুপার্শ্বিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে আসবে সমৃদ্ধি, আসবে সাম্য। এই ছিল WTO-র প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র। ভারত প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও অন্যতম স্বাক্ষরকারি দেশ। অনেক আশার মধ্যে দিয়ে যার জন্ম সে কিন্তু আজ উন্নয়নের প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী সংশয়ের মুখে। কানকুনে কোরীয় কৃষক নিজের বুকে বসিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সারা পৃথিবী ঐ নিদারুণ ঘটনার সাক্ষী। সদ্য অনুষ্ঠিত জেনিভা বৈঠক ব্যর্থ। বলা হচ্ছে যে, দোহা ঘোষণার ভবিষ্যৎ অথৈ জলে। আসলে সমস্যাটা হল অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে কৃষি হোক বা উচ্চশিক্ষা, গোটা পৃথিবী আজ উন্নয়নের প্রশ্নে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে বিভক্ত। পারস্পারিক দোষারোপ ও চাপানউতোর চলছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে WTO-র ভূমিকা নিয়ে শুধু ভারত কেন,এই উপমহাদশের সমস্ত উন্নতিশীল দেশ (যারা প্রায় একই রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রতিনিয়ত বহন করে চলেছে) আজ সন্দিহান। বিশ্ববাণিজ্য একটা ছলমাত্র, আসল উদ্দেশ্য দক্ষিণ গোলার্ধের সম্পদ লুণ্ঠন করে উত্তর গোলার্ধের স্বার্থপূরণ – এই ধারণা একবার দৃঢ় হলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। এই দিন যেন না আসে সেজন্য WTO-র সমস্ত সদস্য দেশকেই দায়িত্বশীল হতে হবে। ভারতের উন্নয়নের প্রশ্নে বলা যায় যে WTO চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারত আজ অনেক ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অতীত মুছে ফেলে তাকে বাজারমুখী ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হচ্ছে। করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত সংস্কার। একটি দরিদ্র জনবহুল ও সমস্যাকীর্ণ দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান বাজার অর্থনীতি দিতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অবধি ভবিষ্যতের গর্ভে।

তবে সদ্য সদ্য সুড়ঙ্গের শেষে আশার আলো দেখা গেছে। দীর্ঘ উনিশ বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে ২০১৪ সালের ২৭ নভেম্বর WTO দীর্ঘকালীন বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য চুক্তিতে সহমত হয়েছে। ১৬০টি সদস্য দেশই এতে একমত। সমস্ত সদস্য দেশই বুঝেছে যে আরও আঠারো কি উনিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। তাহলে বিশ্ব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের কঠোর অবস্থান অনেকটা বাধ্য করলো বাকি উন্নত সদস্য দেশগুলিকে একটা সহমতে পৌঁছতে। নচেৎ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য সংস্কারের সমস্ত আশা শেষ হয়ে যেত।

একথা সত্য যে ভারত দুটো পরিষ্কার পর্যায়কালের মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা অতিবাহিত করেছে – পরিকল্পনাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং একটি বিশ্বায়িত অর্থনীতি যেখানে বাজারি ব্যবস্থা বেশ কায়েমি। সমাজতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের চরিত্র কতটা পালটানো যাবে এবং বিশ্বব্যাপী বাজার অর্থনীতির কতটা গ্রহণ করতে হবে, এ প্রশ্নে কিন্তু থেকেই যায়। এক্ষেত্রে যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নির্ণায়ক। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন, কিন্তু বিকল্প হিসেবে বাজার নিয়ন্ত্রিত নূন্যতম নিয়ন্ত্রণের (Lassesy-faire) অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা কি ভারতের (তথা অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের) অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবে? এ প্রশ্নের উত্তর কালের গর্ভে।

সূত্র:

Kalegame. Saman and Mukherjee Indra Nath (2003) : "WTO and South Asia – From Doha to Cancun" Economic and Political Weekly, Sept. 13.

Dutt. R and Sundaram K.P.M. (2006) : Indian Economy. New Delhi, S. Chand 52nd Edition

Sarma. Devinder (2000) : "Indian Farmers not benefiting from WTO agreement" New Age Weekly, Nov. 12-18.

Patnaik. Utsa (2000) : "The Cost of 'free trade': WTO regime and Indian Economy". New Age Weekly, Oct. 12-15.

Dubey. Muchkund (2006) : "WTO is HongKong Conference – An Appraisal". Economic and Political Weekly, Jan. 7.

Ranga Mamata and Sharma Deepti (2014) : WTO and Indian Agriculture, Indian Journal of Applied Research, June.

Swain Satya Ranjan (2009) : Trade Enternalities of Agricultural Subsidies of World Trade Organisation, American Journal of Economics and Business Administration. 1(3), 225-231.

Agarwal. Pradip (2003) : "Economic Impact of Foreign Direct Investment in South Asia" Matto. Aditya and Stern. M. Robert (edited) **India and the WTO**. Washington DC. A co-publication of the World Bank and Oxford University Press.

Das. Satya. P (2003) : "An Indian Perspective on WTO rules on Foreign Direct Investment". (ed) Matto Aditya and Stern. M. Robert. **India and the WTO**. Washington DC. A co-publication of the World Bank and Oxford University Press.

Rajan. S. Ramkishen (2004) : "Measures to attract FDI". Economic and Political Weekly, Jan. 3.

Ghosh D.N. (2005) : "FDI and Reform". Economic and Political Weekly, Dec. 17.

পালিত, অমিতেন্দু (২০০৬) : "ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজি নিবেশ : সমস্যা ও সম্ভাবনা"। ধনধান্যে, জানুয়ারি।

Kaushik. K.R. and Bansal. Kapil. Kumar (2012) : Foreign Direct Investment in Indian Retail sector, Pros and Cous, International Journal of Emerging Research in Management and Technology.

Lenihan Ashley Thomas (2011) : Foreign Investment in India after the Global Financial Crisis, The GMF Paper Series, India Forum, September.

Abrol. Dinesh (1994) : "Intellectual Property Rights in the Uruguay Round : A Review of Indian Debati" (ed.) K.R.G. Nair and Kumuar Ashok. **Intellectual Property Rights.** Bombay. Allied Publisher Limited.

Nanda. Nitya (2004) : "WIPO Patent Agenda". Economic and Political Weekly, Sept. 25.

Choudhuri. Sudip (2002) : "TRIPS Agreements and Amendment of Patents Act in India." Economic and Political Weekly, Aug. 10.

Dhar. Biswajit and Rao. C Niranjan (2005) : "Reflections on a TRIPS – Compliant LAW". Economic and Political Weekly, Apr. 9.

Gopakumar. K.M. and Amin. Tahir (2005) : "Patent (Amendment) Bill 2005 : A Critique". Economic and Political Weekly, Apr. 9.

Malik. Pramod (2013) : Implication of TRIPS Agreement on India with special reference to Pharmaceutical Sector, Online Interdisciplinary Research Journal, Vol III, Issue VI, Nov – Dec.

Khanna. Pratiba (2005) : "Changing Scenario of Higher Education : Challenges to Quality Assurance and Substance." University News, Feb. 14-20.

Reddy. G. Sudarsana, Reddy. S. Raghanatha and Rammurthy. B.M. (2005) : "GATS and Management Education : "Opportunities and Challenges" University News, May. 9-15.

Bhushan. Sudhanshu (2004) : "Trade in Education Services under GATS : Implications for Higher Education in India." Economic and Political Weekly, June. 5.

Position Paper – Presented at 79th Annual Meeting of AIU at the University of North Bengal on Nov. 18-21, 2004 (2005) : "GATS and its Implication on Higher Education" University News, Jan. 31- Feb. 6.

Mishra Vikrant (2013) : Globalisation and Indian Higher Education, Journal of Educational and Instructional Studies in the World, Feb, Mar, Apr.

Miles Tom (2014) : WTO Clinclhes First Global Trade Deal in its History. www.reuters.com. Nov. 27, 2014.

*****